বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার-কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার-কাছারিমোড়, নীলকুঠি। জলপাইগুড়ি— স্বপন মুখার্জি, ১৭৫/এ, অরবিন্দ কলোনি, আলিপুর দুয়ার জং। বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩

বর্ষ -৪ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর /২০০৭ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

ব্রাত্য মানুষের কথা

মাথার ওপর নিঃসঙ্গ সূর্য। বর্শার ফলকের মতো তীব্র দাবদাহ ছড়িয়ে পড়ছে প্রান্তর জুড়ে। প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ যোজনার কাজ শুরু হয়েছে। মাঠ চিরে কালো রাস্তা তৈরি হচ্ছে কারণ উন্নয়নের রথ ছুটবে। উন্নয়নের ভারবাহী একদল রমণী পিচের রাস্তায় কাজ করছে। পায়ে চট বাঁধা। পিচের গরম বাঁচাতে পায়ে চটের আচ্ছাদনই ওদের একমাত্র সম্বল। গরম পিচ আর পাথর গলে তপ্ত মাটিতে ঝরে পড়ছে। ওরা হাতে লাঠির সঙ্গে কাঁটা লাগিয়ে তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওদের পাশ কাটিয়ে

এরপর ৬পাতায়

ডায়াবেটিসে আলু নিষিদ্ধ নয়

ডায়াবেটিসে (ডায়াবেটিস মেলিটাস) আলু খাওয়া বারণ— এ ধারণার বশীভূত অনেকেই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে ডায়াবেটিস হলে মাটির তলার কোনো সব্জী (ওল, আলু, মুলো, বিট, গাজর ইত্যাদি) খাওয়া উচিত নয়। এই বিশ্বাস যেন একটা অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়ে গেছে।

সাধারণতঃ দু ধরনের ডায়াবেটিস দেখা যায়—এক) ডায়াবেটিস মেলিটাস দুই) ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বা বহুমূত্র। মস্তিস্কের পিটুইটারি নিয়ন্ত্রিত ADH অস্বাভাবিক ক্ষরণের ফলে বৃক্কে

এরপর ৭ পাতায়

প্লুটোকে সৌরজগতের মূলগ্রহ হিসেবে রাখা হল না কেন?

সৌরজগতের সবচেয়ে বাইরের গ্রহ অর্থাৎ নবম গ্রহ প্লুটো, আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৩০ সালে। ২০০৬ সালের ২৪ আগষ্ট পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের পাঠ্যপুস্তকে লেখা ছিল, সৌরজগতের নবম ও সবচেয়ে বাইরের গ্রহ হল প্লুটো। কিন্তু এই তারিখটির পরে প্লুটোর শনাক্তকরণ হল, সৌরজগতের মূল গ্রহের তালিকার বাইরে একটি বামন গ্রহ হিসেবে। এই তারিখ থেকে স্থির হল, সৌরজগতের মূল গ্রহের তালিকায় থাকবে আটটি গ্রহ, তারা হল বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কারণ কী? আর কেই বা নিল এই সিদ্ধান্ত? জ্যোতিবিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশানাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন (International Astronomocal Uniun, সংক্ষেপে IAU) এই সংস্থার সাধারণ সমাবেশ (General Assembly) অনুষ্ঠিত হয় তিন বছর পর পর। ২০০৬ সালের আগষ্ট মাসে এই সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাসে, এবং এই সমাবেশে সারা পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রায় আড়াই হাজার জ্যোতির্বিজ্ঞানী জড়ো হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা হল এই (IAU)-র। ২০০৬ সালের ২৪ আগষ্ট এদের এই সাধারণ সমাবেশে, সৌরজগতের মূল তালিকায় প্লুটোকে আদৌ রাখা হবে কিনা, এই নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভোটাভুটি হয়। আর এইখানেই অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মত পোষণ করেন, এখন থেকে প্লুটোকে আর মূল গ্রহের তালিকায় না রেখে, বামন গ্রহ হিসেবে গন্য করা। আর এই সিদ্ধান্তের কারণ কী, তা বিশ্লেষণ করে দেখার আগে, প্লুটো কেমন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই কাহিনিটুকু আগে বলে নিই।

প্রাচীনকালে শনিকেই মনে করা বা সবচেয়ে দূরের গ্রহ আরও দূরে কোনও গ্রহ থাকতে পারে, এ কথা কারোর কল্পনাতেও ছিল না। শনি পেরিয়ে, অনেক দূরে ছিল শুধু স্থির নক্ষত্রদের জগৎ, আর কিছুই নয়। তাছাড়া সূর্য, চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাত, আর সাত হচ্ছে একটা পূত সংখ্যা। তাই সব কিছুই ঠিকঠাক মিলে গিয়েছিল, নতুন করে আর খোঁজ নেবার কিছুই ছিল না। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষের মনে এরকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস দানা বেঁধে ছিল, সেটা হল পৃথিবীকে বাদ দিলে আর মাত্র পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্বের ধারণা, তারা হল বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এ খবর ব্যাবিলন শহরের জ্যোতির্বিদরাও জানতেন, আর ভারত ও চিনের জ্যোতির্বিদরাও জানতেন। পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে সূর্যের আরও গ্রহ আদৌ থাকতে পারে। তাই আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে যখন উইলিয়ম হার্শেল ইউরেনাস

এর পর ২ পাতায়

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

ভূমিকা - বর্তমান মানব সমাজ যে সব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল গ্লোবাল ওয়ার্মিং। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে বোঝায় পৃথিবীর পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ু এবং সমুদ্রের কয়েক দশকের গড় উষ্ণতার বৃদ্ধি। সম্প্রতি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পৃথিবীর ১১৩টি দেশের সেরা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়েছিলেন। আলোচনার পর তাঁরা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন যাতে তাঁরা বলেছেন পৃথিবীর উষ্ণতা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হারে যদি উষ্ণতা বাড়তে থাকে তবে বর্তমান শতকের শেষে সম্ভাব্য গড় উষ্ণতার বৃদ্ধির পরিমান ৬.৪°সি পর্যন্ত হতে পারে। ঠিক কতটা বাড়বে তা নির্ভর করবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর, যেমন গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণের পরিমাণ, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি। মানব সমাজের এবং প্রাণী জগতের উপর এর ফল হবে ভয়াবহ। বর্তমান প্রবন্ধে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারণ, মানব সমাজ ও প্রাণী কুলের উপর তার প্রভাব এবং সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে মানব সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে সে সব বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হবে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং -এর কারণ - Inter Governmental Panel on Climate Change - এর মতে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াই বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির

এর পর ৪ পাতায়

প্লুটোকে সৌরজগতের মূলগ্রহ

১ পাতার পর

গ্রহটিকে আবিষ্কার করলেন, তখন সারা বিশ্বে একটা রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছিল এবং প্রবল একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল, সেটা ঠিক এখন আন্দাজ করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়। এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে—আগেকার দিনে সবারই জানা ছিল, সূর্যের চারপাশে ঘুরছে ছ'টি গ্রহ, বুধ থেকে শনি পর্যন্ত। স্মরণাতীত কাল থেকেই এদের অস্তিত্বের কথা মানুষের জানা ছিল। তবে কেন ইউরেনাস এবং তার পরেও দুটো গ্রহ নেপচুন ও প্লুটোর অস্তিত্ব মানুষের নজরে এত পরে ধরা পড়ল? এর কারণটা কী?

এর কারণ একটাই। শনি পর্যন্ত সবকটি গ্রহই রাতের আকাশে খালি চোখে দেখা যায়, কারণ তারা প্রত্যেকেই যথেষ্ট উজ্জ্বল। কিন্তু খালি চোখে ইউরেনাস নেপচুন বা প্লুটোকে রাতের আকাশে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর নয়। এই তিনটি গ্রহ মানুষের দৃষ্টিতে না ধরা পড়ার সবচেয়ে বড় কারণটি হল, এদের উজ্জ্বলতার অভাব। যথেষ্ট ভাল দূরবীন না হলে, এই পরের তিনটি গ্রহের গতিবিধি দেখা একেবারেই সম্ভবপর নয়, তার কারণ এদের অবস্থান সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে। ঠিক সেই জন্যই শক্তিশালী দূরবিন আবিষ্কারের আগে, ইউরেনাসকে গ্রহ বলে চেনা একরকম অসম্ভব ছিল। যদিও গ্যালিলিও ১৬০৯ সালে তাঁর দূরবিনের মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে প্রথম তাকিয়েছিলেন, কিন্তু সে দূরবিন তেমন শক্তিশালী মোটেই ছিল না। যথেষ্ট শক্তিশালী দূরবিন তৈরি করে ইউরেনাসকে গ্রহ বলে চিনে নিতে তাই, তারপরেও প্রায় দু'শো বছর অতিবাহিত হয়েছে। ১৭৮১ সালে ইউরেনামের আবিষ্কার হয়, কিন্তু নেপচুন আবিষ্কৃত হয়েছিল এরও ৬৫ বছর পরে ১৮৪৬ সালে।

নেপচুন গ্রহটির আবিষ্কারের কাহিনী খুব মজার, সেটুকু আগে বলে নিই। ঘটনার সূত্রপাত ইউরেনাসকে নিয়ে। ১৭৮১ সালে ইউরেনাসের আবিষ্কারের পর, বিজ্ঞানীরা প্রথমেই গ্রহটির কক্ষপথ গণনার কাজে মন দিলেন। প্রায় ৪০ বছর পর্যবেক্ষণের পর ১৮২১ সালে ফরাসি দেশের গণিতবিদ অ্যালেকিস বোভার্ড ইউরেনাস গ্রহটির গতিবিধিতে কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন, ইউরেনাসের চলার পথ গণনার হিসেব অনুযায়ী যা হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না, বেশ একটু গরমিল থেকে যাচ্ছে। স্থির করা হল কবে, কখন, কোথায় ইউরেনাসকে দেখতে পাওয়ার কথা। তত্ত্ব অনুসারে ভুল ছিল না, কিন্তু কার্যত দেখা গেল, হিসাব মতো সব কিছু ঘটছে না, মাঝে মাঝেই ইউরেনাস তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে একটু এগিয়ে বা পিছিয়ে আসছে। বিচ্যুতির পরিমাণটা অবশ্যই বেশি নয়, কিন্তু ঠিক উপেক্ষার যোগ্যও নয়। কিন্তু সে সময় ওই গরমিলের কারণটা কী, তা কারো মাথায় আসেনি। এর চব্বিশ বছর পরে ১৮৪৫ সালে সমাধানটা খুঁজে পেলেন দু'জন গণিতবিদ—একজন ইংল্যান্ডের অধিবাসী, নাম জন অ্যাডামস, আর একজন ফরাসি দেশের অধিবাসী, নাম আরবেইন ল্য ভেরিয়ে। এঁরা দুজনেই স্বাধীনভাবে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে এই সিদ্ধান্ত করলেন, ইউরেনাসের কক্ষপথের বাইরে এমন কোন অজ্ঞাত গ্রহ আছে যার আকর্ষণ ইউরেনাসের চলনে গোলমাল ঘটাচ্ছে। এখানে একটা কথা জানা প্রয়োজন, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে আমাদের সৌরজগতের প্রত্যেকটি গ্রহ অন্য প্রত্যেক গ্রহকে আকর্ষণ করে, আর এই আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে গ্রহদের নিজস্ব ভর এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বের ওপর। এর ফলে যে কোন গ্রহের চলন অনেকটা নির্ভর করে ওই গ্রহটির ওপর অন্যান্য গ্রহগুলোর সমষ্টিগত আকর্ষণের ওপর। এই সূত্র অনুসারে ইউরেনাসের বেলায় সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ হওয়া উচিত বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের। আসলে কিন্তু দেখা গেল যে তা নয়, ইউরেনামের ওপর আরও এমন কোন একটা আকর্ষণ এসে পড়ছে যার ফলে এর গতিপথ, গণিতের হিসাব অনুযায়ী যা হওয়া উচিত, তা না হয়ে যেন একটু এগিয়ে বা পিছিয়ে আসছে। তার মানেই হল, ইউরেনাসের কক্ষপথের বাইরে এমন আর একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ আছে, যার আকর্ষণের ফলে ইউরেনাসের চলার পথে একটু বিচ্যুতি ঘটছে। অ্যাডামস ও ল্যাভেরিয়ে দু'জনেই ছিলেন গণিতবিদ, তাই তাঁরা অঙ্ক কষে নতুন একটি গ্রহের সন্ধান পেলেও, বাস্তবে রাতের আকাশে গ্রহটিকে চিহ্নিত করতে পারলেন না। কি করে নতুন গ্রহটিকে রাতের আকাশে চিহ্নিত করা যায়, এই তখন হয়ে উঠল দুই গণিতবিদের প্রধান সমস্যা। অবশেষে ল্য ভেরিয়ে তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে ছিলেন বার্লিন মানমন্দিরের এক তরুন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে, তাঁর নাম যোহান গটফ্রায়েড গ্যালী। এই কাগজপত্র গ্যালীর কাছে পৌছয় ১৮৪৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, আর ওই দিন রাতেই গ্যালী তাঁর দূরবিনের সাহায্যে ল্য ভেরিয়ের গণনা মত নির্দিষ্ট অবস্থানে নতুন গ্রহটিকে দেখতে পেলেন—এই নতুন আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম দেওয়া হল নেপচুন, এইটিই আমাদের সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ। নেপচুনের আসল আবিষ্কারক কে তা নিয়ে এক সময়ে ইউরোপে অনেক বিতর্ক হয়েছে, তবে এখন এটা মেনে নেওয়া হয়েছে, এই আবিষ্কারের সাফল্যের কৃতিত্ব অ্যাডামস ও ল্য ভেরিয়ে দু'জন গণিতবিদেরই। তবে আকাশে সর্বপ্রথম নেপচুনকে খুঁজে বের করার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই সেই তরুন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালীর।

এই গেল নেপচুন আবিষ্কারের কাহিনি। নেপচুন আবিষ্কৃত হল ১৮৪৬ সালে, কিন্তু নেপচুন আবিষ্কৃত হবার পরেও দেখা গেল, নেপচুনের চলাফেরায় কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করা যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, সৌরজগতে কি নেপচুনের বাইরেও আরও একটি গ্রহ থেকে গিয়েছে? অনুসন্ধানের ভার হাতে নিলেন মার্কিন দেশের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল। লোয়েল ছিলেন বড় মাপের গণিতবিদও, অঙ্ক কষে তিনি স্থির করলেন, নতুন গ্রহটির কোথায় অবস্থান হওয়া উচিত। কিন্তু শক্তিশালী দূরবিন হাতে থাকা সত্ত্বেও, তিনি নির্দিষ্ট স্থানে গ্রহটি খুঁজে পেলেন না। এর পরে ১৯১৬ সালে লোয়েল প্রয়াতহলেন। লোয়েলের মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে, সেই নির্দিষ্ট স্থানের কাছেই ১৯৩০ সালে, লোয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইভ টমবাউ নতুন গ্রহটি আবিষ্কার করে বসলেন। সৌরজগতের এই নতুন নবম গ্রহটির নাম দেওয়া হল প্লুটো। সূর্য থেকে এই গ্রহটির দূরত্ব ৫৯১ কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বের একটা আভাস এভাবে পাওয়া যেতে পারে—আমরা পৃথিবী থেকে সূর্যকে, যতটা উজ্জ্বল দেখতে পাই, প্লুটোর ওপরিতলে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখা যাবে এই ঔজ্জ্বল্যের এক হাজার ভাগের এক ভাগ।

আই. এ. ইউ প্লুটোর ব্যাপারে এমন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন কেন? এখন এই ব্যাপারে বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। এখন এটা সকলেরই জানা, গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে পরিক্রমা করছে কেপলারের বিধি অনুসারে। এই বিধি অনুসারে গ্রহরা সূর্যকে সুনির্দিষ্ট বেগে সুনির্দিষ্ট পথে পরিক্রমন করছে, আর পরিক্রমণের পথ এক একটি উপবৃত্ত (Ellipse)—অর্থাৎ বৃত্তের মতো একেবারে গোল না হয়ে একটু লম্বাটে ধরণের। বলা যেতে পারে, পথগুলো বৃত্তের মতো না হয়ে একটা ছোট মুরগীর ডিম যেমন একেবারে গোল নয়, একদিকে সামান্য একটু চাপা, সেই রকম। বৃত্তের কেন্দ্র হল একটা বিন্দু, আর এই বিন্দু হতে পরিধির ওপর যে কোনও বিন্দুর দূরত্ব সমান। কিন্তু উপবৃত্তের বেলায় তা নয়, উপবৃত্তের দুটি নাভি (Focus) থাকে, আর এই দুটির নাভির মধ্যে একটিতে সূর্য অবস্থিত। এই উপবৃত্তাকার কক্ষের দরুন, সূর্য থেকে যে কোনও গ্রহের দূরত্ব পর্যায়ক্রমে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায়, গ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে

প্লুটোকে সৌরজগতের মূলগ্রহ

২ পাতার পর

কাছে থাকে সেই অবস্থানকে বলা হয় অনুসূর (Perihelion) অবস্থান, আর পরিক্রমা করতে করতে গ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে দূরে থাকে, এই অবস্থানকে বলা হয় অপসূর (Aphelion) অবস্থান। এই দুই অবস্থানে সূর্য থেকে গ্রহের যে দূরত্ব হয়, তাদের গড়কে সূর্য থেকে গ্রহটির 'গড় দূরত্ব' বা সংক্ষেপে শুধু দূরত্ব বলা হয়। উপবৃত্তটি কতটা প্রায় বৃত্তের মতো অথবা বেশ লম্বাটে ধরণের, তা নির্ভর করে তার 'উৎকেন্দ্রতা' (Eccentricty)-র ওপর। উৎকেন্দ্রতা যত কম হবে, উপবৃত্ত ততটাই প্রায় বৃত্তাকার, আর উৎকেন্দ্রতার মান যত বেশি হবে, উপবৃত্ত তত লম্বাটে ধরণের। উৎকেন্দ্রতা ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যখন তার মান শূন্যতে পরিণত হয়, তখন উপবৃত্তটি একটি বৃত্তে পর্যবসিত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন উৎকেন্দ্রতার মান ক্রমশ বাড়তে থাকে, তখন পরিক্রমণ পথ ডিমের আকৃতি না হয়ে একটা লম্বা, পটলের আকৃতিতে পরিণত হয়—এদের বলা হয় সুদীর্ঘ উপবৃত্ত, অনেক ধূমকেতু সূর্যের চারপাশে পরিক্রমা করছে, কিন্তু তাদের পরিক্রমণ পথ এক একটি সুদীর্ঘ উপবৃত্ত। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করার সময় হ্যালির ধূমকেতুর লাগে ৭৫-৭৬ বছর। হ্যালির ধূমকেতুর পরিক্রমণ পথ একটি সুদীর্ঘ উপবৃত্ত।

এবারে পর্যালোচনা করতে পারি, সৌরজগতের কয়েকটি গ্রহের পরিক্রমণ পথের উৎকেন্দ্রতা। পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা হল ০.০১৭, খুবই কম, তার মানে হল সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ প্রায় বৃত্তাকার। বৃহস্পতির কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা হল ০.০৪৮, শনির ০.০৫৬, নেপচুনের ০.০০৯। এর মানেই হল, এই সব গ্রহের পরিক্রমণ পথ প্রায় বৃত্তাকার। কিন্তু প্লুটোর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা হল ০.২৫০ এর তাৎপর্য হল প্লুটোর পরিক্রমণ পথ যথেষ্ট ডিমের আকৃতি, আর এর ফলে মাঝে মাঝেই প্লুটো নেপচুনের পরিক্রমণ পথের ভেতরে চলে আসে। এমনটি হয়েছিল ১৯৭৯ সালে থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত, যখন প্লুটোর পরিক্রমার পথ ছিল নেপচুনের পরিক্রমার পথের অভ্যন্তরে অর্থাৎ ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্লুটো ছিল সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ, আর সবচেয়ে বাইরের নবম গ্রহ হয়ে বিরাজমান ছিল নেপচুন। এর থেকে একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট, সেটা হল এই, সৌরজগতে সব গ্রহের সম্পূর্ণ বিভিন্ন কক্ষপথ বিচারে স্যূর্য তার পাশে পরিক্রমা করতে করতে প্লুটো কখনো কখনো অন্য গ্রহের পরিক্রমার পথের অভ্যন্তরে চলে আসে। এটা একটা বড় রকমের অসঙ্গতি বলে গণ্য করা হল। সৌরজগতে অন্য কোনও গ্রহের এমন আচরণ লক্ষ করা যায় না।

এখন আর একটা ব্যাপার বুঝে নেওয়ার আছে। পৃথিবী, সূর্যের চারপাশে অনবরত পরিক্রমা করে চলেছে। পৃথিবী যে তলের ওপর সূর্যকে পরিক্রমা করে চলেছে, একে বলা হয় ক্রান্তিবৃত্তের তল (Ecliptic Plane)। এখন এই তলটিকে আমরা চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারি। সৌর জগতের অধিকাংশ গ্রহরাই সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ করছে, কিন্তু তাদের পরিক্রমণ পথ এই ক্রান্তিবৃত্তের তলের ওপরেই অবস্থিত। কিন্তু প্লুটোর পরিক্রমণ পথ এই ক্রান্তিবৃত্তের তলের সঙ্গে প্রায় ১৭ ডিগ্রি কোণ করে চলে গেছে। সৌরজগতের আর কোনও গ্রহ সূর্যের চারপাশে এই ভাবে পরিক্রমণ করে না—এটাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্লুটোর দ্বিতীয় বড় রকমের অসঙ্গতি বলে গণ্য করেন।

প্লুটোর উপগ্রহ স্যারন (Charon) প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৮ সালে। আর এর পরে হাবল মহাকাশ দূরবিন প্লুটোর আরও দুটি উপগ্রহ অবিষ্কার করে, এদের নাম রাখা হয় নিক্স (Nix) এবং হাইড্রা (Hydra)। যে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার কথা এই প্রসঙ্গে, তা হল ভারকেন্দ্র কাকে বলে। একে ইংরেজিতে বলা হয় (Centre of Gravity) কোনও বস্তুকে হাতের ওপর রাখলে, আমরা নিচের দিকে একটা বল অনুভব করি। বস্তুটি যদি খুব ভারী হয়, এই বল এত বেশি অনুভূত হয় যে আমরা বস্তুটিকে হাতের ওপর রাখতে পারি না। কেন এই বল অনুভূত হয়? কারণ বস্তুটিকে পৃথিবী সর্বদা আকর্ষণ করছে। এই বলকেই বলা হয় অভিকর্ষীয় বল (Force of Gravity)। যে কোনও বস্তুর ওপর পৃথিবী মোট যে অভিকর্ষ বল প্রয়োগ করে, তাকেই বলা হয় বস্তুর ওজন। মনে রাখতে হবে, ওজন কার্যত একটা বল। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আমরা জানি, বল = ভর x ত্বরণ। সাধারণভাবে আমরা বস্তুর ওজন এবং ভরের মধ্যে পার্থক্য করি না। ভর বলতে কী বুঝব? যে কোন বস্তুর মধ্যে কতটা জড় পদার্থ আছে সেটাই ভর। কিন্তু ওজন কার্যত একটি বল— যে বলের দ্বারা পৃথিবী বস্তুকে আকর্ষণ করে তাকেই ভর বলে। যে কোনও বস্তুর ভরকে, অভিকর্ষজ ত্বরণ বা g দিয়ে গুণ করলে তার ওজন পাওয়া যায়। কাজেই ভর ও ওজন সম্পূর্ণ পৃথক। বস্তুকে পৃথিবীর যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, তার ভর একই থাকবে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g-এর মান বিভিন্ন বলে সেই একই বস্তুর ওজনও বিভিন্ন হবে। আবার কোনও বস্তুকে আমরা অসংখ্য কণার সমষ্টি বলে মনে করতে পারি। এই সকল কণার প্রত্যেকের কিছু ভর আছে, অতএব ওদের কিছু ভার বা ওজন আছে। আমরা এও জানি বস্তুর ওজন হচ্ছে বস্তুর ওপর পৃথিবী নিজ কেন্দ্রের দিকে যে আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাই। একটি বস্তুর কণাগুলির ওজন কতকগুলো সমমুখী সমান্তরাল বলের উদ্ভব করে। এদের সংযোজন করলে যে লব্ধি বা সংহতি বল (Resultant) পাওয়া যায় তা বলগুলোর সমমুখী ও সমান্তরাল। এই লব্ধিকেই বলা হয় বস্তুর মোট ওজন, আর এই লব্ধি একটি বিশেষ বিন্দু দিয়ে নিচের দিকে কাজ করে, এই বিন্দুকেই বলা হয় ওই বস্তুর ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity)। বস্তুকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন, বস্তুর ভারকেন্দ্রের কোনরকম কোনও পরিবর্তন হবে না। এটা ভাল করে বুঝতে হবে, যেকোনও বস্তুর ভারকেন্দ্র একটি মাত্র বিন্দুতেই অবস্থিত থাকে। একটি বৃত্তাকার চাকতি অথবা থালার ভারকেন্দ্র অবস্থিত ঠিক আর কেন্দ্র বিন্দুতে। এখন আর একটা ব্যাপার বুঝতে হবে, সেটা হল সাধারণ ভারকেন্দ্র (Common Centre of Gravity) কাকে বলে? একটা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে এক কিলোগ্রাম চাল ওজন করতে হলে, পাল্লার এক দিকে এক কিলোগ্রাম বাটখারা রাখা হল, তারপর অন্য পাল্লায় চাল দিয়ে যখন পাল্লার ওপরের দন্ডটি অনুভূমিক (Horizontal) হয়ে স্থির হয় তখন আমরা জানি ওই চালটুকুর ওজন এক কিলোগ্রাম। যখন দুটি পাল্লা অনুভূমিক হয়ে স্থির হয়, তখন বাটখারার ভারকেন্দ্র এবং চালের ভারকেন্দ্র, এই দুটির সাধারণ ভারকেন্দ্র অবস্থিত থাকে পাল্লার ঠিক মধ্য বিন্দুতে।

এখন আমাদের পৃথিবীর ভারকেন্দ্র তার কেন্দ্রে, আর চাঁদের ভারকেন্দ্র তার কেন্দ্রে, কিন্তু এই দুজনের সাধারণ ভারকেন্দ্র অবস্থিত পৃথিবীর ধরাপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে। ঠিক এমনি ভাবে সৌরজগতে আর যেসব গ্রহ, যাদের উপগ্রহ আছে, যেমন মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন, এদের বেলাতেও মূল গ্রহ ও যেকোনও উপগ্রহের সাধারণ ভারকেন্দ্র গ্রহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কিন্তু প্লুটো এর ব্যতিক্রম। প্লুটো এবং আর উপগ্রহ স্যারনের সাধারণ ভারকেন্দ্র অবস্থিত প্লুটোর অভ্যন্তরে না হয়ে সম্পূর্ণ বাইরে। অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে প্লুটোর এখানেও একটা বড় রকমের অসঙ্গতি।

আর একটি প্রসঙ্গ এখানে আনার নিতান্ত প্রয়োজন, তা হল 'কুইপার বেল্ট বস্তু' (Kuiper Belt Object) সংক্ষেপে (KBO)। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে কুইপারের একটি মতবাদ আছে আর এই মতবাদ এতদিন স্বীকৃত ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী সূর্যের জন্ম একটি বিশাল নীহারিকা থেকে,

প্লুটোকে সৌরজগতের মূলগ্রহ

৩ পাতার পর

নীহারিকার প্রচন্ড ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়েছিল কতগুলো প্রাকগ্রহ, ইংরেজিতে এদের বলা হয় Proto Planet আর প্রাকসূর্য (Proto Sun)ও ধীরে ধীরে স্বীয় অভিকর্ষের প্রভাবে সঙ্কুচিত হয়ে তার বর্তমান অমিত তেজোদীপ্ত রূপ পাচ্ছিল। প্রচন্ড ঘূর্ণনের জন্য স্বভাবতই উৎপন্ন প্রাকগ্রহগুলোর মধ্যে ভারী পদার্থগুলো জমা হয়েছিল কেন্দ্রের দিকে, আর হাল্কা পদার্থ ছিল বহির্ভাগে। কিন্তু সূর্য যখন বর্তমান রূপ লাভ করল, তখন একটা বড় পার্থক্যের সূচনা হল। তখন সূর্যের বিকিরণের প্রচন্ড চাপে প্রাকগ্রহগুলোর বাইরের হাল্কা অংশগুলো ক্রমশ দূর থেকে দূরান্তরে বিতাড়িত হতে লাগল, এর ফলে প্রাকগ্রহগুলো অনেক পরিমাণে তাদের দেহবস্তু হারিয়ে ফেললো, জন্ম পেল ঘন, ভারী সুগঠিত গ্রহগুলো, যাদের দেহে ভারী পদার্থের পরিমাণ আনুপাতিভাবে অনেক বেশি। দেখা গেল বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের ঘনত্ব বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগুলোর চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি, এর কারণই হল সূর্য থেকে তাদের দূরত্বের তারতম্য, অর্থাৎ তাদের ওপর সৌর বিকিরণের চাপের তারতম্য। প্রাকগ্রহগুলো অনেক পরিমাণে তাদের দেহবস্তু হারালো, সেই সব বস্তু গেল কোথায়? কিছু চলে গেল বহু বহু দূরে ধূমকেতুদের আঁতুড় ঘরে, যেখান থেকে ধূমকেতু এক এক করে সূর্যের কাছে চলে এসে সূর্যকে পরিক্রমা করতে থাকে। আর বেশ কিছু বস্তু প্লুটোর পরিক্রম পথের অনেক বাইরে থেকে সূর্যকে পরিক্রম করতে লাগল, কুইপারের মতবাদ অনুযায়ী এদেরই বলা হয়ে থাকে 'কুইপার বেল্ট বস্তু'। এটা এতদিন মতবাদ হয়ে রয়েছিল। কিন্তু ১৯৯২ সালে দুজন মার্কিন দাভে জুইট এবং জেন লুস সর্বপ্রথম একটি সুইপার বেল্টবস্তুকে আবিষ্কার করে বসলেন, এর নাম দেওয়া হল 1992 QB1। তারপরে দশ বছরের মধ্যে প্রায় একশোর ওপরে কুইপার বেল্ট বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, এরা সকলেই প্লুটোর পরিক্রমণপথের বাইরে অনেক দূরত্বে সূর্যকে পরিক্রমা করে চলেছে। সূর্য থেকে এদের দূরত্ব ৩০ থেকে ৫০ আলোকবর্ষ দূরে। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্লুটোর চেয়ে ছোট, আবার কেউ কেউ প্লুটোর চেয়ে অনেক বড়। ২০০৫ সালের ২৯ জুলাই আবিষ্কৃত হল জেনা (Xena) বলে একটি কুইপার বেল্ট বস্তু, আবিষ্কার করলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (California Institute Of Technology)-র বিজ্ঞানী মাইকেল ব্রাউন, আর এর ব্যাস প্লুটোর চেয়েও বড়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় সমস্যা দেখা দিল, তাহলে প্লুটোর বাইরে যেসব গ্রহ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাদের সকলকে এখন থেকে সৌরজগতের মূল গ্রহের জোটে রাখা হবে? ভবিষ্যতে এই সংখ্যা প্রতিবছরই বেড়ে যাবে, তাহলে প্রত্যেক বছর সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। তাই এই আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহলে এক আলোড়ণ তুলে দিল, না আর প্লুটোকে সৌর জগতের মূলগ্রহের তালিকায় রাখা যায় না, আর এরই পরিণতি হল ২০০৬ সালের ২৪ আগষ্ট IAU-র সাধারণ সমাবেশে আড়াই হাজার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভোটাভুটি পর্ব এবং শেষকালে প্লুটোকে বিদায় দিয়ে বামন গ্রহ হিসেবে রাখা। এখানে আর একটা কথা বিশেষ ভাবে খেয়াল করতে হয়, আশির দশকে আবিষ্কার হয় সিসিডি ক্যামেরা (CCD Camera), এই ইলেকট্রনিক ক্যামেরা অত্যন্ত শক্তিশালী—এই ক্যামেরা আর শক্তিশালী দূরবিন, এই দুইয়ের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে কুইপার বেল্ট বস্তুদের আবিষ্কার। এরা না আসলে এদের আবিষ্কার আরও অনেক পেছিয়ে যেত।

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট এম. পি. বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ ফাডামেন্টাল রিসার্চ এম. বিড়লা প্লানেটোরিয়াম, কলকাতা

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

১ পাতার পর

কারণ। গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্য দিয়ে সূর্য থেকে আগত বিকিরিত তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারে, অর্থাৎ এই গ্যাসগুলি এই বিকিরণের ক্ষেত্রে তাপস্বচ্ছ। এই তাপ ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত ভূমির সংস্পর্শে ভূমির নিকটবর্তী বায়ুর উষ্ণতা বাড়ে। সন্ধ্যার পর ভূপৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে তা পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ভেদ করে মহাশূন্যে চলে গেলে কোন সমস্যা থাকত না। কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস বাতাসে থাকায় ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপের একটা বড় অংশ গ্যাসগুলির মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ এই গ্যাসগুলি পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপের ক্ষেত্রে তাপ-অস্বচ্ছ। কারণ এই গ্যাসগুলির মধ্য দিয়ে সব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ার এই বিকিরণের ক্ষেত্রে তা তাপ-অস্বচ্ছ। যা হোক, এই তাপের অনেকটাই তাই পৃথিবীর বায়ুমন্ডলেই আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে।

গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে প্রধান হল কার্বন ডাই-অক্সাইড। এছাড়া নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাসগুলিও ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হচ্ছে। দিনের পর দিন এভাবে এই গ্যাসগুলি সঞ্চিত হতে থাকায় গ্রিন হাউস গ্যাসের স্তর আরও ঘন হয়ে উঠছে। যার ফল গড় উষ্ণতার বৃদ্ধি। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে কলকারখানা, যানবাহনের পরিমাণ প্রভৃতি। এবং এগুলির জন্য প্রয়োজন হয়েছে বিদ্যুৎ, কয়লা, খনিজতেলের। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় কয়লা পুড়িয়ে। যানবাহন চলে পেট্রোল বা ডিজেলে। এগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসৃত হয়ে বাতাসে মেশে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমেরিকায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতি বছর ২.৫ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। এগুলিই হল কার্বন ডাই-অক্সাইডের সর্ব প্রধান উৎস। এর খুবই যানবাহনের স্থান। যানবাহন থেকে নিঃসৃত এই গ্যাসের পরিমাণ বছরে ১.৫ বিলিয়ন টন। আমেরিকার মত গ্রিন হাউস গ্যাস আর কোন দেশ নিঃসরণ করে না। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ আমেরিকায় বাস করে; কিন্তু জ্বালানীর দহনের ফলে নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইডের ২৫ শতাংশই নিঃসরণ করে আমেরিকা। চিন, জাপান এবং ভারতবর্ষ এই তিনটি দেশ মিলিত ভাবে বছরে যত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে আমেরিকা তার চেয়ে অনেক বেশি করে।

গ্রিন হাউস গ্যাসের জন্যই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-IPCC-এর এই মতের সমর্থন জানিয়েছে বিশ্বের অন্ততঃ ৩০টি বিজ্ঞান সংস্থা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলির National Academy of Science. American Association of Petroleum Geologist হল একমাত্র বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান যা IPCC-এর মতের বিরোধী। IPCC-এর মতে ১৯৯০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতা ১.১°সি থেকে ৬.৪°সি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

ফলাফল — গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলতে থাকবে। এই বরফ গলা জল সমুদ্রে গিয়ে পড়বে এবং সমুদ্রের জলতল ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। বিংশ শতাব্দীতেই সমুদ্রের জলতলের বৃদ্ধি ১৫ সিএম থেকে ২৩ সিএম পর্যন্ত হয়েছে। ৯০ বছর পর জলতলের বৃদ্ধি আরও ১৮ সিএম থেকে ৫৮ সিএম পর্যন্ত হতে পারে। এর ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী বহু দেশ এবং অঞ্চল সমুদ্রের জলের নীচে চলে যাবে। আমাদের দেশেও সুন্দরবন এই বিপদের সম্মুখীন।

বছর পাঁচেক আগে সার্ক দেশগুলির বিজ্ঞানীরা সাবধান করে দিয়েছিলেন

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

৪ পাতার পর

যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে বাংলাদেশ তথা গোটা দক্ষিণ এশিয়ার আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে। ৪০ বছরের বৃষ্টিপাতের হিসাবের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অসময়ের বন্যায় বহু এলাকা প্লাবিত হবে। তার কারণ সমুদ্রের জল বেশি উষ্ণ হচ্ছে এবং সমুদ্র জলের বাষ্পীভবনের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে মেঘ ও বৃষ্টির পরিমাণও বাড়বে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ বছর যে হারে দক্ষিণ এশিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে তাতে জুন মাস থেকেই বন্যার কবলে পড়েছে বিভিন্ন দেশ। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে নানা ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপন্ন হচ্ছে। এক দিকে প্রবল বর্ষণ ও বন্যা, অন্য দিকে ভয়াবহ খরার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যখন বন্যা তখন বৃষ্টির দেখা নেই কাশ্মীরে। ২০০২ সালে আমেরিকার কলোরাডো, আরিজোনা প্রভৃতি স্থানে তাপপ্রবাহ, ধূলি ঝড়, খরার প্রকোপ দেখা দেয়। ২০০৩ সালে তীব্র তাপ প্রবাহে ইউরোপে ২০ হাজার মানুষ মারা যান। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে সমুদ্রের জল উষ্ণ হওয়ায় তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে সাধারণ ঝড় অপেক্ষাকৃত প্রবল ঝড়ে পরিণত হচ্ছে। কোথাও কোথাও ঘূর্ণি-ঝড় দেখা দিচ্ছে।

খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রভাব ভাল রকম পড়ছে। খরা বন্যার ফলে খাদ্য নষ্ট তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ায় শস্যের উৎপাদনও কম হচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ৪০টি প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এর কারণ বার্ষিক উষ্ণতায় এই প্রজাতিগুলির ইকোসিস্টেম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আবার শস্য উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর ভাইরাসের সংখ্যাও বাড়ছে, বাড়ছে তাদের ক্ষতি করার ক্ষমতাও।

বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উষ্ণতা আরও বাড়লে নতুন নতুন ভয়াবহ জীবাণু ও ভাইরাসের প্রকোপ বাড়বে, জটিল ও দুরারোগ্য অসুখের হার বাড়বে। এখনই দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর গঠনগত ও চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটছে ফলে অনেক সাধারণ জীবাণু অপকারী হয়ে উঠছে। যেমন "ব্যালান্টিডিয়াম কোলাই" নামে একটি জীবাণু বিশেষ ক্ষতিকর ছিল না। কেবলমাত্র হালকা ধরণের অ্যামিবায়োসিস এই জীবাণুর জন্য হতে পারত। কিন্তু এখন তারা ফুসফুসের সংক্রমণ ঘটাচ্ছে যার ফলে শুকনো কাশি ও হাঁপানি হচ্ছে। "ব্লাস্টোসিস্টিস হোমিনিস" জীবাণুটি থেকে আগে রোগাক্রান্ত হবার কোন ভয় ছিল না, কিন্তু তারা বর্তমানে জটিল ডায়েরিয়ার সৃষ্টি করছে। "প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স" ছিল সাধারণ ম্যালেরিয়ার জীবানু, কিন্তু বর্তমানে তা জটিল ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করছে যা মৃত্যুর কারণও হচ্ছে।

প্রতিকারের উপায় :— গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিষময় ফল থেকে মানব সভ্যতাকে তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার একটা উপায় হল — যে যে কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয় সেই সেই কারণগুলিকে দূর করা অর্থাৎ এক কথায় গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করা। আগেই বলা হয়েছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। যদি আমরা বাড়িতে এবং অফিস কাছারিতে এমন সব বৈদ্যুতিন সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করি যেগুলিতে বিদ্যুৎ খরচ কম হয় তবে বিদ্যুতের চাহিদা হ্রাস পাবে। সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণও হ্রাস পাবে। তাছাড়া পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে কয়লার ব্যবহার কমাতে হবে। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এছাড়া জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ প্রভৃতির উৎপাদন বাড়াতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে এই ধরনের বিকল্প শক্তির ব্যবহার বাড়লেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। যানবাহনের ক্ষেত্রেও দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। হাইব্রিড গ্যাস বিদ্যুৎ ইঞ্জিন দূষণের পরিমাণ অনেকটাই কমাতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধা হল শিল্প সংস্থাগুলি, যারা মুনাফা কমে যাবে বলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করছে। আমেরিকা দূষণ সৃষ্টিকারী দেশগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে থাকলেও সে দেশের যানবাহন শিল্প এবং বিদ্যুৎ শিল্পের মালিকরা সে দেশের সরকারকে চাপ দিচ্ছে যাতে সরকার দূষণ কমানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণে কোন আইন না করে। বুশ প্রশাসনও মালিক শ্রেণীর স্বার্থে শুধুমাত্র স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণের কথাই বলছে। এ কারণেই ২০০১ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত কিয়োটো সম্মেলনে গৃহীত দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে আমেরিকা সই করেনি। আজও করতে রাজী নয়। আমেরিকার অর্থনীতি তাতে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে কথাটা আমেরিকা প্রকাশ্যে বলে না তা হল এই যে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় ভার বহন করতে হবে তাতে শিল্পপতিদের মুনাফা হ্রাস পাবে। শুধু আমেরিকা নয়, গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়াও এই চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেনি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে তারা ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসৃরণ ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেখতে রাজী যদি আমেরিকা, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ তাদের এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়। বাস্তবে তা যে ঘটবে না তা তারা জানে। ফলে তাদেরও কিছু করতে হবে না।

দেখা যাচ্ছে কোন দেশই গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আন্তরিক নয় বরং নানা কুযুক্তি দিয়ে এই দাবীকে নস্যাৎ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু কেন? এর কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ক্ষমতাসীন সরকারগুলির লক্ষ্য সে দেশের মালিক শ্রেণীর মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করা, জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা নয়। তাই প্রকৃতি ধ্বংস হয় হোক, খরা, বন্যায় মানুষ মারা যাক, সভ্যতা রসাতলে যাক কোন কিছুতেই তাদের কিছু আসে যায় না। মালিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা—কত কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে কত বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়। তাই পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের অনীহা। এতে মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। আমাদের বুঝতে হবে কোন পুঁজিবাদী দেশের সরকার গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস করার ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী ভূমিকাই গ্রহণ করবে না মালিক শ্রেণীর স্বার্থে। তাই শুধুমাত্র পরিবেশ আন্দোলন করে পরিবেশকে রক্ষা করা, মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত দিন টিকে থাকবে ততদিন গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে রোধ করা যাবে না। তাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দেশে দেশে আন্দোলন গড়ে তুলে সে দেশের সরকারকে বাধ্য করতে হবে কিছুটা হলেও গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে। তা না হলে আমরা পরিবেশ রক্ষায় আন্দোলন করছি বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারি। কিন্তু পরিবেশ তথা মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারব না।

ডঃ প্রদীপ কুমার দত্ত,
বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি। একে বাঁচান।

ব্রাত্য মানুষের কথা

১ পাতার পর

চলে যাচ্ছে অনেক সুখী মানুষের গাড়ি। তাদের মুখে রুমাল চাপা ধুলো এড়াবার জন্য। মাঝে মাঝে তপ্ত হাওয়া আশপাশের বালি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুখী মানুষের গায়ে দু-একটি তপ্ত বালি পড়লে ফোস্কা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সাঁওতাল রমণীরা নির্বিকার। ওরা মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছে। ওরা দূষণ নামক শব্দটি উচ্চারণ করতে শেখেনি। ওদের জীবনে একটিই জ্বালা। প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ যোজনার রাস্তা তৈরির জন্য তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই জমা হয়েছে ইতস্তত ভাবে। আর তা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আশপাশের এলাকাতে। গাড়ি চড়া একদল সুখী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একটি অভিযোগ পত্র পাঠালো—প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ যোজনার রাস্তা তৈরির সময় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই উড়ে যাতায়াত করা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। তাই কিছু করতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন সরকারি পরিদর্শক হাজির হলেন পরিদর্শনের জন্য। পরিদর্শনের সময় ওই সাঁওতাল রমণীদের জিজ্ঞাসা করা হল গরম পিচে যে আপনারা কাজ করেন এতে কষ্ট হয় না? আর এই ধুলোবালিতে কাজ করার জন্য আপনারা কোন ব্যবস্থা নেন না? ওরা হতবাক। এই প্রশ্নের উত্তর ওদের জানা নেই। শীর্ণকায়, গায়ের চামড়া জ্বলে যাওয়া রমণীরা নিরুত্তাপ। ওদের জীবনে দূষণ অনুপস্থিত। ওরা কেবল পিচ গলানো মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দেয় পেটের জ্বালা মেটাতে। ভারতবর্ষ জুড়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ যোজনার সমস্ত রাস্তা তৈরিই একদিন হয়তো শেষ হবে, কিন্তু এই ইতিহাসে সাঁওতাল রমণীরা থেকে যাবে এক উপেক্ষিত অধ্যায়ের শেষ পর্বে।

বয়স খুব বেশি হলে ১৯ কি ২০। চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। তবে ওর বেশির ভাগ সময়টাই কাটে গাড়ির তলায় অন্ধকারে। বিশাল মোটর গ্যারেজ। ১৮ থেকে ৩০ বছরের অনেকগুলি ছেলে কাজ করছে। প্রত্যেকের পরনে বড়জোর ১টি গেঞ্জি, আর হাফপ্যান্ট। কয়েকজন ফুলপ্যান্ট পরলেও সেগুলো আয়তনে একটু ছোট। সকালবেলা এসেই ওদের ঢুকে পড়তে হয় গাড়ির তলায় মেশিন সারাতে। গাড়ির মেশিন সারাতে হবে, যন্ত্রাংশ খুলে দেখতে হবে, তেলে ভেজাতে হবে, পরিষ্কার করে আবার গাড়িতে লাগাতে হবে। এসব কিছুর মধ্যেও একটা রেডিও ওদের ওখানে চলে। তাতে ক্রমাগত এফ এমে গান হয়। সুন্দর লোভনীয় জিনিসের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। কিন্তু কেউ গান শোনে বলে মনে হয় না। গানটা একটানা বেজেই যায়। আর ব্যাটারি ফুরোলে থেমে যায়। ছেলেগুলির সর্বাঙ্গ কালিতে ভরে যায়। কাজের শেষে ওরা হাত ধোয়। কিন্তু সে হাত থেকে কালো রঙ আর ওঠে না। এতে ওরা একেবারেই চিন্তিত নয় কারণ তেলকালির কালো ওদের জীবনসঙ্গী। তেলকালিতে ওদের নখগুলো ক্ষয়ে গেছে। স্কুলের ছেলেরা পেশাগত রোগের বিষয় নিয়ে নানা কারখানায় ঘুরছিল। মোটর গাড়ি সারানোর কারখানাতে স্কুলের ছাত্ররা ঢুকে কয়েকজন শ্রমিককে যখন জিজ্ঞসা করল যে এই বদ্ধ পরিবেশে আপনারা তেলকালি নিয়ে যে কাজ করেন তাতে দূষণে আক্রান্ত হন না? ছেলেগুলির এখনও প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যায়নি। ওরা হেসে উত্তর দেয়..... ও সমস্ত কিছু ব্যাপার নয়। এই তেলকালিই আমাদের ভাত জোটায়। তোমাদের মতো লেখাপড়া আমরা শিখিনি। আর শেখারও সুযোগ হয়নি। স্কুলের ছেলেরা ওদের মতো করে দূষণ সংক্রান্ত সাবধান বাণী বলার চেষ্টা যখন শুরু করছে তখনই হঠাৎ কারখানার অধিকর্তা ধবধবে জামা পরে এসে স্কুলের ছেলেদের বকুনি দেন। কারখানা থেকে বার করে দেন। কারখানার সব থেকে বয়স্ক মানুষ নীরেনদা আস্তে আস্তে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের ছেলেদের বলে...... তোমরা বাবা ফিরে যাও। এসব প্রশ্ন করে আর আমাদের বিব্রত করো না। ভগবানের কাছে প্রার্থণা করি তোমাদের কাউকে যেন এ কাজ করতে না হয়। এ কথা বলে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নীরেনদা ছাত্রদের বললো যে ১৫ বছর বয়সে বাবা মারা যাবার পর এ কাজে লেগেছি। প্রথমে কষ্ট হত। বাড়িতে গিয়ে ভাত খেতে পারতাম না। তেলকালির গন্ধ নাকে লেগে থাকত। বছর খানেকেই ব্যাপারটা সয়ে গেল। দূষণ আমাদের জন্য নয়। এটা বাবুদের ব্যাপার। ছাত্রগুলি কেন জানি না হঠাৎ করে নীরেনদাকে হাত জোড় নমস্কার করে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের সবুজ মন এখনও দূষণে আক্রান্ত হয়নি। তাই নীরেনদার কথায় ওরা বিচলিত হয়।

হাতভর্তি নকশা কাটা নানান কাচের চুড়ি। দেখলেও ভাল লাগে। ছোট থেকে বৃদ্ধা কাচের চুড়ি দেখলেই আকৃষ্ট হয়। পছন্দমতো দু-এক গাছা কিনেও ফেলে। হাওড়ার জগাছা-তে মেয়েদের অতি প্রিয় এই কাচের চুড়ির ছোট ছোট অনেক কারখানা। ছোট ছোট টালির চাল। কয়লার ঘাঁটি। খাঁ খাঁ করে আগুন জ্বলছে। তার পাশেই অ্যাসিডের চৌবাচ্চা। নানা হরেক সমারোহ। চুড়ি থেকে শুরু করে বহু জিনিসই সেখানে অ্যানোডাইজিং হচ্ছে। অ্যাসিডের গন্ধে ভরপুর চারিদিক। পরিবেশ আইনের ভাষায় বিপজ্জনক তরল পদার্থ নিয়ে কারখানাগুলোতে কাজ হয়। ফলে ব্যাপক দূষণ সৃষ্টি হয়। পরিবেশের কেতাবি ভাষায় বলতে গেলে অন্যতম দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানা। ছেঁড়া স্যান্ডো গেঞ্জি। হাতে কোন দস্তানা নেই। দূষণ থেকে কোন রকম রক্ষা পাবার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু নির্বিকার কয়েকটি মানুষ কাজ করে যাচ্ছে। রোজ পায় ৪০-৫০ টাকা। নেই কোন সুরক্ষা। নেই কোন দূষণের দুশ্চিন্তা। এসব কারখানার পাশে এক হোমড়া চোমড়া ভদ্রলোক বাড়ি করলেন। করার কয়েক দিনের মধ্যেই অভিযোগ দূষণ ছড়ানোর। শ্রমিকেরা দূষণের কথা শুনে তো হতবাক। ওদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে। কারখানা এবার বন্ধ হবে। কিন্তু ওরা কিছু বুঝতেই পারছে না কোথায় দূষণ। আর কেনই বা কারখানা বন্ধ হবে। কারখানার শ্রমিকরা দূষণের কিছু বোঝে না। বাবু বলেন তোমাদের শরীর দূষণ সইতে পারলেও আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। শ্রমিকরা নিশ্চুপ। বাবু তখনও অনড়। ওরা গোবিন্দের সঙ্গে পায়ে পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তবে সরস্বতী পুজোর আগে বাবুর বাড়িতে বাসন্তী রঙের চুড়ি পৌঁছেছিল যদি বাবুর মন ভেজে। কিন্তু কিছুই হয়নি। ওরা হারিয়ে গেছে। কারণ কারখানা আর চলছে না। মালিক মনে করেছে কারখানা ভেঙে বহুতল বাড়ি করলে তার সাশ্রয় অনেক বেশি। গোবিন্দের দল হারিয়ে যায়। ওরা হয়তো খুঁজে নেবে আরো একটা টালির চাল যেখানে তৈরি করবে সুদৃশ্য চুড়ি যা সুখী মানুষের ঘরে রিমঝিম করে বাজবে।

বাবার দেওয়া নামটা সম্ভবত ও নিজেও ভুলে গেছে। ছোটবেলা থেকেই মিষ্টির দোকানে কাজ করত। পাড়ার ছেলেরা আর দোকানের মালিক সবাই ওকে ছানা বলে ডাকত। যে বয়সে কাজে লেগেছিল, বয়সটা ছোট বলেই হয়তো সবাই ওকে ছানা বলত। মিষ্টির দোকানের ছানার সঙ্গে ওর নামটা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে ছানাকে হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে থাকতে দেখলাম। ওর সঙ্গে আমার পরিচিতি দীর্ঘকালের। আমার এক বন্ধুর আত্মীয়া অসুস্থ হয়ে ভরতি হয়েছিল হাসপাতালে। তাকে দেখতে গিয়েই ছানার সঙ্গে দেখা হল। হাসপাতালের মেঝেতে নিঃসঙ্গ ছানা পড়ে আছে। আমায় দেখে ডুবন্ত মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। খোঁজ নিয়ে জানলাম দীর্ঘ সময় রসগোল্লা তৈরি করতে করতে উনুনের উত্তাপে ওর হাতের স্নায়ু শুকিয়ে গেছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা হল। ওঁরা বিজ্ঞের মতো বললেন যে পেশাগত রোগ। কিছুই করার নেই। ছানা বাঁচবে কিনা জানি না। বাঁচলেও ও কাজ করে খেতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। পৃথিবীর উত্তাপ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কতটা সংকট ডেকে আনবে আমার মতো অ-পন্ডিতের তা ভাবার যোগ্যতা নেই। তবে এটুকু বুঝি উনুনের

ব্রাত্য মানুষের কথা

৬ পাতার পর

উত্তাপ ছানার মতো একটি মানুষের জীবন শুষে নিয়েছে। ছানা যে কদিন বাঁচবে ভিক্ষাবৃত্তিই হয়তো ওর শেষ সম্বল হবে।

প্রত্যেক বছর ৫ জুন বিশ্বজুড়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। অনেক আলোচনা হয়েছে পরিবেশ দূষণ নিয়ে। আলোচনা হয়েছে পৃথিবীর উষ্ণায়ন নিয়েও। আলোচনা হয়েছে দারিদ্রের সঙ্গে দূষণের বিন্যাসের। কিন্তু সবই আলোচনার স্তরেই ছাপার বইতে তত্ত্ব কথা হিসেবে রয়ে যায়। সাঁওতাল রমণী থেকে শুরু করে নীরেনদা, গোবিন্দ, ছানা এরা সবাই দূষণের দুশ্চিন্তা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। ওরা দুঃখ পেতেও ভুলে গেছে। ওরা কেবলই আচ্ছন্ন হয়ে আছে দুমুঠো ভাতের জন্য। এরা সবাই সভ্যতার প্রান্তিক মানুষ। উন্নয়নের রথে ওরা ব্রাত্য। এদের কষ্ট নিয়ে ভাবনা আজও সম্ভবত দানা বাঁধতে পারেনি।

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

আলু নিষিদ্ধ নয়

১ পাতার পর

জলের পুনঃশোষণ ব্যাহত হয় ফলে রোগী ঘন ঘন (কিন্তু স্বল্প মাত্রায়) মূত্র ত্যাগ করে, এই ধরণের ডায়াবেটিসকে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বলে। আমাদের উদরে পাকস্থলীর পাশে অবস্থিত অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এই ইনসুলিন কোষে কোষে গ্লুকোজের দহন নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কারণে এই হরমোন ক্ষরণের যদি অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তবে দেহ কোষে গ্লুকোজ দহনেরও ব্যাঘাত ঘটে এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে পৃথক হয়। এর ফলে কখনো কখনো কখনো দেহে বিভিন্ন অংশে গ্লুকোজের দহনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্লুকোজ সরবরাহ হয় না এবং শরীর দূর্বল হয়ে যায়।

ডায়াবেটিস মেলিটাস সারাতে বিভিন্ন ধরণের ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় যদিও সরাসরি ইনসুলিন ইনজেক্ট করে দেহে ইনসুলিনের ঘাটতি মেটানো এই রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়। এগুলো ছাড়াও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের আর একটি উপায় হল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, আমরা যে ধরণের খাদ্য গ্রহণ করি, সেগুলি হল কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন ফ্যাট, ভিটামিন অজৈব লবণ এবং জল। আমরা মূলতঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ করি। এই কারণে আমাদের শরীরের শক্তির বেশির ভাগটাই আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে যার প্রধান উৎস ভাত, রুটি, চিনি ইত্যাদি। এটা জানা দরকার যে মাছ-মাংসে কার্বহাইড্রেট থাকে না আর ডাল-ভাত মানেই তাতে প্রোটীন-ফ্যাট থাকবে না, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

ডায়াবেটিস মেলিটাস রুখতে ওষুধপত্র গ্রহণের পাশাপাশি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। আমাদের অনেকের মধ্যে একটা সংস্কার প্রচলিত আছে যে, ডায়াবেটিস (মেলিটাস) রোগীদের ভাতের বদলে রুটি খাওয়া ভালো। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে ভাত ও রুটি দুইটিই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার। ফলে এই রোগ কমাতে কেউ যদি ভাতের বদলে প্রয়োজনের বেশি রুটি খান, তবে তাঁর পক্ষে রোগটা নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন এমনকি প্রায় অসম্ভব হয়ে পরে, শরীরে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, ততটুকুই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এইজন্য ডায়াবেটিস রোগী যদি দিনে কয়েকটুকরো আলু, বীট, গাজর প্রভৃতি খান, তাতে খুব একটা ক্ষতি হয় না। তাই বলে ডায়াবেটিস রোগী যদি তার প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ করেন, অর্থাৎ অত্যধিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে শরীরে শক্তির অভাব ঘটে শরীর দূর্বল হয়ে যাবে ও অন্যরকম সমস্যা দেখা দেবে।

তথ্যসূত্র :- ভবানী প্রসাদ সাহু, —এম. এস. ডি.

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনে কেন শুধু উষ্ণতা নিয়ে আলোচনা হয় :

আমাদের প্রায় সকলেরই জানা যে জলবায়ু বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের ৩০ থেকে ৩৫ বছরের গড় আবহাওয়াকে বোঝায়। জলবায়ু বলতে কখনোই কেবল কোন অঞ্চলের উষ্ণতা বা তাপমাত্রাকে বোঝায় না। উষ্ণতা ছাড়াও বৃষ্টিপাত, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি জলবায়ুর অর্ন্তগত। এগুলোর যে কোনটিতে পরিবর্তন ঘটলে তা জলবায়ুকে প্রভাবিত করতে পারে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কেন উষ্ণতা বাড়ার প্রতিই বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে? সম্ভাব্য উত্তরটি হচ্ছে যে প্রথমত জলবায়ুর নানান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উষ্ণতা পরিমাপের তথ্য বেশ সুলভ। আর উষ্ণতা সরাসরি গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয়ত, উষ্ণতা মাপার বেলায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে তাকে মাপতে হয়। মানুষের কাজের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই সময়কালটিকে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে ধরা হয়। সাধারণত ভূপৃষ্ঠের বার্ষিক গড় উষ্ণতার পরিবর্তনকেই আমরা হিসেবের মধ্যে ধরি। কেননা ভূপৃষ্ঠের ওপরের উষ্ণতা বাড়া বা কমার যে কোন প্রবণতার তথ্যই বেশ বিশ্বাসযোগ্য কারণ এতে কোন ছোট অঞ্চলের ফারাকও গড় হয়ে যায়।

ভূপৃষ্ঠ যে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে এটা মাপতে গেলে বেশ দীর্ঘকাল লাগে। সাধারণ থার্মোমিটার দিয়েই এই তথ্য নেওয়া হয়। পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রতিদিনের উষ্ণতার তথ্য রাখা হয়। পরে সামগ্রিক ভাবে এ তথ্যগুলোর গড় থেকে পৃথিবী জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। স্থলভাগের নানান জায়গায় এবং জলভাগে সমুদ্রের ওপরে জাহাজে বিগত প্রায় ১৫০ বছর ধরে এরকম ভাবে উষ্ণতা মাপা চলছে। এসব তথ্যও মানুষের হাতে আছে। এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিংশ শতাব্দে পৃথিবী জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা বেড়েছে ০.৪°-০.৮° সেন্টিগ্রেড। দুটি স্পষ্ট পর্যায়ে এই উষ্ণতা বেড়েছে। প্রথমটি ১৯১০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭৬ সাল থেকে বর্তমান কাল অব্দি। এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে অবশ্য উষ্ণতা কিছুটা কম ছিল। বিগত ১৫০ বছরের মধ্যে ১৯৯০ এর দশক ছিল সবচেয়ে উষ্ণ। আর একক ভাবে উষ্ণতম বছরগুলো হল ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৪ এবং ২০০৬।

বিগত ১৫০ বছরের উষ্ণতার তথ্য থেকে এ-ও দেখা যাচ্ছে যে শহরাঞ্চলগুলো পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা গ্রামের তুলনায় বেশি উষ্ণ। কংক্রিটের তৈরি বাড়ি ও পাকা রাস্তা গাছপালার চেয়ে বেশি সূর্যের আলো শোষণ করে বলেই বেশি উষ্ণ হয়ে ওঠে। এ ঘটনাকে আরবান হিট আইল্যান্ড এফেক্ট বলা হয়।

ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা মাপতে পৃথিবী জুড়ে বিস্তীর্ণ ভাবে নানা পরিমাপ কেন্দ্রে তাপমান যন্ত্র (থার্মোমিটার) রাখা হয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনই এটাও সত্য যে প্রয়োজনের তুলনায় এটা যথেষ্ট বা সম্পূর্ণ নয়। সেই জায়গাগুলোতেই তাপমান যন্ত্র রাখা সম্ভব হয়েছে যেখানে মানুষ যেতে পেরেছে। সমুদ্রের ওপরে উষ্ণতা পরিমাপকারী জাহাজগুলো দীর্ঘদিন *এর পর ৮ পাতায়*

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও

৭ পাতার পর

একই জায়গায় স্থির থাকেনি। ফলে পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতার তথ্য একেবারে ঠিক নয়। এই অসুবিধা এড়াতে বিজ্ঞানীরা এখন উপগ্রহের মাধ্যমে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতার পরিমাপ করছেন। এতে অনেক বেশি জায়গা জুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতার প্রায় নির্ভুল তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর উষ্ণায়ন বোঝার আর যে উপায় আছে — হিমবাহের তথ্য :
পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ১০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে হিমবাহ। এর বেশির ভাগটাই রয়েছে কুমেরু অঞ্চলে এবং গ্রিনল্যান্ডে। উষ্ণ জলবায়ুতে হিমবাহ গলে যায়। ফলে আকারেও ছোট হয়ে পিছিয়ে যায়। বেশ কয়েকশো বছর ধরেই মানুষ নানান হিমবাহের আকারের দৈর্ঘ্য মেপে রেখেছে। ফলে হিমবাহ গলে গিয়ে আকারে ছোট হলে সহজেই তা ধরা যায়। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সাল অব্দি ৩৬টি হিমবাহকে আলাদা ভাবে মাপা হয়েছিল। দেখা গেল যে এর ৩৫টিই আকারে ছোট হয়ে পিছিয়ে গেছে। একটিই আকারে বড় হয়ে এগিয়েছে। ১৯০০ থেকে ১৯৮০ সাল অব্দি ১৪৪টি হিমবাহের তথ্য নেওয়া হয়েছিল। তথ্যে দেখা গেল যে মাত্র দুটি এগিয়েছে। বাকি ১৪২টি পিছিয়ে গেছে। ২০০৫ সালের এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ১৭০০ সাল থেকে সারা পৃথিবীর নানান হিমবাহের দৈর্ঘ্যে যে গড় বদল ঘটেছে তার শুরু ১৮০০ সাল থেকে। এ সময় থেকে হিমবাহের গড় দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে হিমবাহের আকার দ্রুত কমে আসতে থাকে। আর এটা ঘটেছে প্রায় পৃথিবীর সব জায়গাতেই। পৃথিবী জুড়ে এভাবে হিমবাহের আকার ছোট হয়ে পিছিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণটি হচ্ছে উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাব। পৃথিবী জুড়ে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা যে বেড়েছে তা তো তাপমান যন্ত্রে মাপা উষ্ণতা বাড়ার তথ্যে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। অবশ্য শুধুই যে উষ্ণায়নের জন্য হিমবাহের দৈর্ঘ্য কমেছে তা নয়। মেঘাচ্ছন্নতা কমে হিমবাহের ওপর বেশি সূর্যালোক পড়লেও বরফ গলে হিমবাহের আকার ছোট হয়ে যায়। আবার, হিমবাহের এগোনো বা পিছানো—এ ঘটনা দুটিই নির্ভর করে তুষার জমা ও তা গলে যাওয়ার অনুপাতের ওপর। তুষারপাত কমে গেলে হিমবাহ পিছিয়ে যায়, এমনকী সেখানে কোনরকম তাপমাত্রা না বাড়লেও।

এখানে একটি কথা অবশ্যই বলার যে যেহেতু পৃথিবীর শীতল অঞ্চলেই হিমবাহ থাকে, তাই হিমবাহের আকার ছোট হওয়া বা পিছিয়ে যাওয়া থেকে পৃথিবী জুড়ে তাপমাত্রা বাড়ার প্রবণতা হিসেব করা গোটা ছবিটার একটি অংশ মাত্র।

সমুদ্রতল :
প্রধানত তিনটি কারণে উষ্ণ জলবায়ুতে সমুদ্রতল উঁচু হয়ে ওঠে। প্রথমত, আর সব পদার্থের মতো জল গরম হলে আয়তনে বাড়ে। ফলে উষ্ণ জলবায়ুতে জলের আয়তন বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, উষ্ণতার প্রভাবে হিমবাহ বা ভূমিভাগের ওপরের অন্যান্য বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রে মেশে। এতে সমুদ্রের জলতল বাড়ে। হিমযুগে ঠিক এর উল্টোটা ঘটে। বিগত হিমযুগে বিপুল জলরাশি বরফের আকারে জমেছিল মহাদেশীয় হিমবাহ হয়ে। এর ফলে বর্তমানের চেয়ে সমুদ্রতল নিচু হয়ে গিয়েছিল প্রায় ১২০ মিটার। তৃতীয়ত, স্থলভাগে হ্রদে ও ভৌমজলস্তরে যে বিপুল জলরাশি জমা থাকে তারাও সমুদ্রতলের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কৃষিতে সেচের কাজে বা অন্য উদ্দেশ্যে ভৌমজলস্তর থেকে পাম্প করে জল তুলে ব্যবহার করলে তা শেষে গিয়ে সমুদ্রেই মেশে নানান নদীর মাধ্যমে। এতেও জলতল বেড়ে যেতে পারে।

নানান জায়গায় জোয়ারের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে বিংশ শতাব্দে পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়েছে প্রতি বছরে প্রায় ১.৫ মিলিমিটার বা গোটা শতাব্দে ১৫ সেন্টিমিটার। এই তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে উনিশ শতকের তুলনায় বিংশ শতকে সমুদ্রতলের উঁচু হয়ে যাওয়ার হার বেশি। সমুদ্রতল এভাবে উঁচু হওয়ার বেশ কটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। সমুদ্রতল উঁচু হওয়ার পিছনে বরফ গলা জলের অবদান, সমুদ্র বিজ্ঞানীরা বলছেন, খুব বেশি নয়, সামান্যই। স্থলভাগের জমা জলের পরিবর্তন সমুদ্রতল উঁচু হয়ে ওঠার পিছনে এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলেও এই ব্যাপারটা বেশ অনিশ্চিত। তাই বিজ্ঞানীরা, তাপমান যন্ত্রে মাপা সমুদ্রজলপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ার তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি নিশ্চিত যে পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিংশ শতাব্দে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়েছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রাহুল রায়, শিক্ষক ও পরিবেশ কর্মী

বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী

কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অন্বেষক (বিজ্ঞান পত্রিকা) এর উদ্যোগে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী গত জুন মাস থেকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চালানো হয়েছে। বিজ্ঞানের মজা ও হাতে কলমে বিজ্ঞানের নানা প্রয়োগ যথা—বিনা আগুনে যজ্ঞ, সূর্যগ্রহণ, শক্তদড়ি সহজে ছেঁড়া, আগুন খাওয়া, নাড়ীবন্ধ, ডিমের সাঁতার কাটা, ফুটন্ত তেলে হাত রাখা, সহজে চোর ধরা জলের রঙের পরিবর্তন আলু থেকে বিদ্যুৎ এরকম প্রায় ৫০টি "বিজ্ঞানের মজা" পুস্তিকা সহ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কর্মশালা, প্রশ্নোত্তর ও হাতে কলমে করানো হচ্ছে।

ফোরামের সম্পাদক শেখর ঘোষ জানান প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এধরণের কর্মশালার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের উদ্যোগ যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

গত ৮ সেপ্টেম্বর কোচবিহার সদর গভঃ হাইস্কুলে বিজ্ঞানের মজা হাতে কলমে দেখানো হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা হয়।

বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার প্রকাশক জয়দেব দে জানান বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা, কেন বা কিকরে হলো, প্রশ্ন করতে শেখানো। পাশাপাশি সর্বস্তরে নিরাপদ পানীয় জল, হাসপাতালে সবরকম জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ ও সাপ ও কুকুরের কামড়ের ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ করার জন্য প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

—জয়দেব দে, সংবাদদাতা

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৩৩০৫৬০৭৮।
সম্পাদক মণ্ডলী— পান্নালাল মানি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা। ফোন: ৯২৩১৬৭৫২৩৬ থেকে মুদ্রিত ।
সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* **E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.**